অগ্নিঝরা একটি দিনের কথা

কামরুল মান্নান আকাশ

ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক পুনর্মিলনী ২০১৩ উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনের জন্যে লিখতে যেয়ে কেবলই হারিয়ে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে উত্তাল সেই দিনগুলির মাঝে। মনে পড়ছে মিছিলের সেই সব সাহসী মুখের কথা যাদের বুকের রক্তে লাল হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর। মনে পড়ছে ঘরে না ফেরা সেইসব বীর তরুণদের কথা। আমি কোন নেতা নই, নই কোন বিপ্লবী, আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমার সময়ের এমন এক গৌরবময় ছাত্র আন্দোলনের যা আজ স্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে চলেছে।

আমি তখন ভূতত্ব বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র আর দিনটি ছিল ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সে এক অগ্নিঝরা দীর্ঘ দিন। বাংলাদেশে সেই দিনটি আজ ম্লান হয়ে গেছে "ভ্যালেন্টাইন ডে" র ভালবাসার উচ্ছ্বাসে। কিন্তু আমায় আজো তাড়া করে ফেরে সেই স্মৃতি তাই পারি না ভালবাসা দিবসের ভালবাসায় ভেসে যেতে।

দেশে তখন চলছিল সামরিক শাসন। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই সেদিন প্রথম রাস্তায় নেমে এসেছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে জান্তা সরকার ঘোষণা করে গণবিরোধি শিক্ষানীতি। প্রতিবাদ আর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশের ছাত্রসমাজ, নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও দেশের আপামর জনসাধারণ সমর্থন জানায় ছাত্রদের দাবীর প্রতি। কিন্তু স্বৈরাচার পড়েনা দেয়ালের লিখন। তাই বাড়ে নির্যাতনের মাত্রা। চলল লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাস। খবর আসতে লাগল সংগ্রামী সাথীদের গুলিতে নিহত হওয়ার। স্বজন হারানোর বেদনা আগুন হয়ে জ্বলে উঠলো বুকের মধ্যে। সে আগুন ছড়িয়ে গেল সারা দেশে। গঠিত হল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সরকারকে আল্টিমেটাম দেয়া হল, ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষানীতি বাতিল করা না হলে সেদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবরোধ করা হবে।

প্রস্তুতি চলতে লাগল চূড়ান্ত বিজয়ের। দলে দলে ছাত্ররা ছুটে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বটতলায় তিল ধরনের স্থান নেই। যে কোন মূল্যে তারা দাবী আদায়ে প্রস্তুত। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে সবার অঙ্গীকার দাবী আদায় না করে ঘরে না ফেরার। শোনা যাচ্ছে রাতে বিডিআর নামবে, ব্যাপক ধর পাকড় শুরু হবে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে মিছিল। আমরা হলে হলে ঘুরে ছাত্রদের মনোবল অটুট রাখতে সাহস দিতে লাগলাম। হামলার আশঙ্কায় অনেক রাত পর্যন্ত মটর সাইকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ গুলো পাহারা দিলাম।

অবশেষে এলো ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সকাল থেকেই আসতে লাগল মিছিলের পর মিছিল। বটতলা,মধুর ক্যান্টিন, টি,এস,সি ও কলাভবন এলাকা পরিণত হল জনসমুদ্রে। শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত পুরো বিশ্ববিদ্যালয়। সবাই অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তাদের নিয়মিত বসার জায়গা মধুতে তারা নেই, বটতলা, টি,এস,সি অপরাজেয় বাংলা কোথাও তারা নেই। গুজব তার হাত পা মেলতে লাগল। কেউ বলছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কেউ বলছে সরকার টাকা দিয়ে তাদের কিনে নিয়েছে। এরপর নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল তাদের না আসার কারণ। ছাত্র নেতাদেরকে জানানো হয়েছে আজকের ঘেরাও কর্মসূচী বন্ধ করা না হলে সরকার যে কোন মূল্যে তা দমন করবে। সরকারী বাহিনী গুলি চালিয়ে পাখীর মত ছাত্রদের হত্যা করবে। তারা সাহস পাননি বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলার। আবার কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দিয়ে এর দায়ভারও গ্রহণ করতে চাননি। এটা ছিল এক হঠকারী সিদ্ধান্ত। তারা ভুলে গেছে কোন সরকার, কোন বাহিনী দমন নীতি চালিয়ে কোন আন্দোলনকেই স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আন্দোলনের ইতিহাস। এর ছাত্রদের সাহস আকাশচুম্বী। এরা সালাম, বরকত, আসাদের বংশধর। বায়ান্নতে রক্ত দিয়ে আদায় করেছে মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার, ঊনসত্তরে পতন ঘটিয়েছে আইয়ুব সরকারের,আর একাত্তরে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। আজ এই সমাবেশে যারা এসেছে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে জয়ী হওয়র জন্যেই এসেছে।

ছাত্ররা অস্থির হয়ে উঠছে কখন শুরু হবে মিছিল। মধুর ক্যান্টিনে মধ্যম সারির এক নেতা টেবিলে উঠে যেই বলেছেন আজ ঘেরাও কর্মসূচী বাদ দিয়ে শুধু বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হবে অমনি চারিদিক থেকে ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। স্লোগান উঠল বাংলার মাটিতে মীরজাফরের ঠাঁই নাই। টেনে সেই নেতাকে নামিয়ে দেয়া হল। এরপর আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় সাধারণ ছাত্র-কর্মীদের হাতে। আহ্বান করা হয় কর্মসূচীর পক্ষে বিপক্ষে হাত তুলে মতামত জানানোর। আন্দোলনের বিপক্ষে কোন হাত সেদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। শপথ উচ্চারিত হল সংগ্রামের। মহান বিজয়ের সংগ্রাম মহৎ থেকে মহতর এই বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে শুরু হল আমার দেখা এক দীর্ঘতম ছাত্র মিছিল। মিছিলের সম্মুখ ভাগ যখন হাইকোর্টের কাছে, শেষ ভাগ তখনো কলা ভবন থেকে বেরুচ্ছে। চারিদিক শ্লোগানে প্রকম্পিত করে সে মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে ভয়হীন চিত্তে। এ যেন হেলাল হাফিজের কবিতার পঙক্তি “এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ”। এগিয়ে চলেছে তারুণ্য, এগিয়ে চলেছে যৌবনের অমিত শক্তি যা ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে স্বৈরাচারের। স্বাধীনতার পর এত বড় মিছিল দেখেনি কেউ, দেখেনি বাংলাদেশ! শিক্ষা ভবনের সামনে কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে তার ওপারে জল কামান, লাঠি, বন্দুক আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রায়ট পুলিশ ও আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন। লাল পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাজিস্ট্র্যাটের আজ্ঞাবহ। চারিদিকে শ্লোগান উঠছে “বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই-এ লড়াইয়ে জিততে হবে”, “লড়াই লড়াই লড়াই চাই - লড়াই করে বাঁচতে চাই”, “রক্তের বন্যায়-ভেসে যাবে অন্যায়”.....।

বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত মিছিল কাঁটা তারের বাঁধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সাইরেন বাজিয়ে জল কামান থেকে বেরিয়ে আসে গরম পানি। কারো কারো গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। একটু পিছিয়ে আবার এগিয়ে যাই। এবার শুরু হয় লাঠি চার্জ আর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া। চারিদিক গ্যাসের ঝাঁঝ আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় পুলিশের সাথে ছাত্রদের তীব্র সংঘর্ষ। তা ছড়িয়ে পড়ে কার্জন হল, হাই কোর্ট, শিশু একাডেমী পুরো এলাকা জুড়ে। পুলিশের ছুঁড়ে দেয়া টিয়ার গ্যাস তুলে নিয়ে আবার তাদের দিকেই ছুঁড়ে দিচ্ছি, আর ছাত্রদের সনাতনী অস্ত্র ঢিল বৃষ্টির মত যেয়ে পড়ছে তাদের উপর। পুলিশ পিছু হটে। শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল আবার এগিয়ে যায়। স্লোগানের এক যাদুকরী শক্তি আছে। বিশৃঙ্খলা বা বিপদের মাঝে স্লোগান ধরলে তা এক কণ্ঠ থেকে ছড়িয়ে পড়ে হাজারো কণ্ঠে। যোগায় সাহস আর শক্তি। দেয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। ছাত্রদের এই মারমুখী ভাব দেখে ভয়ে এবার শুরু হল গুলি আর বেয়নেট চার্জ। সামনে কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল। গুলির কাছে অসহায় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। রাস্তা ছেড়ে সবাই ঢুকে পড়ল কার্জন হল, হাইকোর্ট, শিশু একাডেমী চত্বরে। আমরা ঢুকে পড়লাম কার্জন হলে। তাকিয়ে দেখি পুলিশও পিছনে তাড়া করে আসছে। দেখলাম পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে একজন লুটিয়ে পড়ল আর অনেককে পেটাতে পেটাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ চলে যাওয়ার সাথে সাথে দৌড়ে গেলাম পড়ে থাকা ছেলেটির কাছে। যেয়ে দেখি তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে এসেছে আর সে বোধহীন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। এক ঝালমুড়ি ওয়ালার কাছ থেকে গামছা নিয়ে তার পেট বেঁধে দিলাম। সহযোদ্ধার রক্তে রঞ্জিত হল হাত!

এমন সময় কয়েকজন ছেলে দৌড়ে এসে বলল আমার বাবা তঁদের পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। এই ছেলে গুলিই একটু আগে যখন টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝে চোখ জ্বলছিল আর পানি পড়ছিল আমাদেরকে কলাপ্সিবল গেটের ভিতর থেকে পানির পাইপ দিয়ে পানি দিয়ে সাহায্য করছিল। আব্বা ছিলেন সেই সময় ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান। তিনি ফার্মেসী বিল্ডিঙয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আমার সব কিছুই দেখেছেন। পুলিশের একশন শেষ হওয়ার পর আমার খোঁজে এদের পাঠিয়েছেন। এই ছাত্ররা বলল আব্বা উপাচার্যকে ফোন করে অনুরোধ করেছেন পুলিশ উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে। আমি ছুটে যেয়ে আব্বাকে বললাম এম্বুল্যান্স ডাকতে হবে, না হলে এই আহত ছেলেটিকে বাঁচানো যাবেনা। ভেবেছিলাম হয়ত আমাকে তিরস্কার করবেন। কিন্তু না আব্বা আমাকে কিছু বললেন না। সাথে সাথে ফোন করে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এম্বুল্যান্স আনালেন। এরপর আব্বা ও আমরা কয়েকজন মিলে আহতকে গাড়িতে করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ইমারজেন্সিতে নিয়ে যাই। ডাক্তার তাঁকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার পর আব্বা আমাকে বাসায় যেতে বললেন। আরও বললেন আম্মা খুব চিন্তা করছেন গুলির খবর শুনে। মায়ের কথা শুনে মনটা কেমন করে উঠল আব্বার সাথে বাসায় চলে এলাম। সেই সময় আমরা থাকতাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঈসাখান রোডের শিক্ষক নিবাসে। বাসায় যেতেই মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বুঝলাম মা কতটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। খেতে বসে শুধু বমি আসছিল কিছুই খেতে পারছিলাম না। বার বার বেয়নেটের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন জয়নালের ছবি

ভেসে উঠছিল আর ক্রোধে ফেটে পড়ছিলাম। আমার মা চিন্তিত হয়ে আমার ডাক্তার চাচাকে ফোন করলেন। চাচা আম্মাকে বললেন টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝে আর শক থেকে এমন হচ্ছে, রেস্টে থাকতে উপদেশ দিলেন। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ভাইরা এসে জানাল জয়নাল মারা গেছে, অসংখ্য আহত আর গ্রেফতার হয়েছে। আরও মারা গেছে জাফর, শিশু দীপালিসহ আনুমানিক দশ জন। সবার লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে। বিকেলে বটতলায় শোক ও প্রতিবাদ সভা হবে। শুনেই ছটফটিয়ে উঠলাম তক্ষুনি বেড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু না মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে যেতে হবে। সেই সময় দেখলাম আব্বা আবার বেরুচ্ছেন, বললেন ভিসি সিন্ডিকেটের জরুরী মীটিং ডেকেছেন। তিনি সেই সময় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। আমি আস্তে করে জিজ্ঞাস করলাম আমি বটতলার মিটিং এ যেতে পারি কিনা। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তারপর বললেন যাও কিন্তু সাবধানে থেকো। আমি জানতাম আব্বা আমাকে বাঁধা দেবেন না। তাঁর সময়ে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে। হয়ত সেদিনের আমার মাঝে তিনি তার ফেলে আসা তারুণ্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আম্মাকে বলতেই না না করে উঠলেন। বললাম আজকে জয়নালের জায়গায় আমারও এমনটি হতে পারত। এরপর আম্মা দুর্বল হয়ে গেলেন। আমি বেড়িয়ে এলাম আর আম্মা দোয়া পড়তে লাগলেন।

বটতলায় এসে দেখি পুরো কলা ভবন এলাকা বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে। সবার বুকে শোকের কালো ব্যাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর আবার রঞ্জিত হল শহীদের রক্তে! সবাই অপেক্ষা করছে শহীদ জয়নালকে শেষ বিদায় জানানোর। এমন সময় শয়ে শয়ে পুলিশ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের উপর। আবার চলল তাদের তাণ্ডব। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে দৌড়াতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং পুলিশের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় আর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হলনা। এছাড়া দিনভর লড়াই করে করে সবাই ছিল ক্লান্ত আর অবসন্ন। আমরা কয়েকজন যেয়ে আশ্রয় নিলাম কলা ভবনের তিন তলার টয়লেটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি পুলিশ প্রতিটি তলায় রুমে রুমে তল্লাশি চালিয়ে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে ধরে পেটাচ্ছে আর গ্রেফতার করে গাড়িতে নিয়ে তুলছে। করিডরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এবং ক্রমশ তা এগিয়ে আসছে আমদের দিকে।আমরা জানালা দিয়ে বেরিয়ে সুয়েরেজের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে এলাম। পিছন দিকটাতে কোন পুলিশ দেখতে পেলাম না। সেদিনের মত পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কাঁটাবন দিয়ে বেরিয়ে এলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এবং শহরে জারী করা হয় কারফিউ।

লাশ তারা কেড়ে নিয়ে গেছে কিন্তু সেখানে তো জয়নাল ছিলনা! ছিলনা তাঁর প্রাণ! ছিলনা তাঁর স্বপ্ন! জয়নাল তাঁর প্রাণ, তাঁর স্বপ্ন গচ্ছিত রেখে গেছে এই সব সংগ্রামী ছাত্রদের কাছে। মনে মনে সবাই তখন আওড়াচ্ছি আমরা সবাই জয়নাল হব জয়নাল হত্যার বদলা নেব। আমরা আসছি, আবার আসছি, দ্বিগুণ হয়ে আসছি। ওরা জানেনা জয়নালরা কখনো মরেনা!

সেদিন কেউ জানত না আজ যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তা একদিন পরিণত হবে ছাত্র-গণ অভ্যুত্থানে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই নেতৃত্ব দেবে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে। আজ যার শুরু তা শেষ হতে সময় লেগেছিল সাতটি বছর। বিজয় ছিনিয়ে এনে ছাত্ররা পরিয়ে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে আরেকটি জয়ের পালক। যা আজ ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অতীতের আমিও একজন ছিলাম, ছিলাম এক সাধারণ সৈনিক!